International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-III, May 2023, Page No.18-31
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.18-31

হংসেশ্বরী মন্দির: কিছু অজানা তথ্যের উৎস সন্ধানে

সুকৃতি চক্রবর্তী
আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধানিক, প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

From eighteenth-nineteenth century, many temples were built in different places in Hooghly district. But before these temples, few in number existed. Frequent changes of the rivers flow, floods, many ancient temples no longer remain today in Hooghly district. Not only that, stone was scare in this country, many brick temples were built in this district at that time. And the life of brick is short, so the temples didn't last long. Despite all these adversities, few temples in Hooghly district still survive, one of them being the Hamseswari temple at Bansberia in Hooghly district. Many temples of Chala, Shikhar, Ratna and Dalan series are seen in Hooghly district, but Hamseswari temple with thirteen peaks in Bansberia occupies a prominent place in the history of Hooghly and Bengal. This essay wil discuss the hamseswari temple and the adjacent Anantavasudeva temple. Hamseswari temple was built following a particular aechitectural style according to Tantra, which will be discussed in this paper.

Keywords: Anantavasudeva, Hamseswari, Kundali shakti, Shat-Chakra, Radha-krishna, Kali-yantra, Sri-chakra, Sri Lalita Sahasranama

বঙ্গের ইতিহাসে প্রাচীন রাজবংশের মধ্যে অন্যতম হল বংশবাটি বা বাঁশবেড়িয়া রাজবংশ। বকতিয়ারউদ্দিন খলজীর বাংলা আক্রমণের সময়ে এই বংশের রাজা দেবদত্তের বংশধর বুরান দত্ত তাঁর বাসস্থান নদীয়া থেকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদের 'দত্তবাটি'তে স্থাপন করেন।[১] কিন্তু দ্বারকানাথ, দেবদত্তের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ, মুসলমানদের নিপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর বাসস্থান 'দত্তবাটি' থেকে বর্ধমানের পাটুলীতে নিয়ে আসেন। পরে রাঘব রাই, দ্বারকানাথের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে প্রাপ্ত জমিদারীর সুশাসনের জন্য পাটুলী ত্যাগ করে হুগলী নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। রাঘব দত্ত যার নাম দেন 'বংশবাটি', যা বর্তমানে 'বাঁশবেড়িয়া' নামে খ্যাত। এই রাঘব রাই-এর সন্তান রামেশ্বরের সময়ে ভোঁসলের নেতৃত্বে মারাঠারা বাঁশবেড়িয়ায় ব্যাপক লুটপাট চালাতো। তাই তিনি সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিপুল ব্যয়ে রাজপ্রাসাদের চারিধারে ১ মাইল দীর্ঘ, ৫০ ফুট উঁচু একটি পরিখা বা গড় খনন করেন। তারপর থেকেই রাজপ্রাসাদ 'Gurbati' নামে পরিচিত হয়। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পরিখার চারিপাশে বাঁশঝাড়ের বেড় তৈরী করে দেন। তাই এই অঞ্চলটি 'বাঁশবেড়িয়া' নামে খ্যাত হয়। এর পাশাপাশি তিনি একটি দুর্গ তৈরি করেন। এই দুর্গটিতে তলোয়ার, ঢাল, পাইক, তীর-ধনুক দ্বারা সজ্জিত

বেশ কয়েকজন সৈন্য এবং কয়েকটি কামানও থাকতো। মারাঠারা ত্রিবেণীর কাছে এলেই চারপাশের মানুষেরা এই দুর্গের ভিতরে চলে যেতো।[২] পরে বর্গি আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেলে জলের উপর পাকা রাস্তা তৈরি হয় এবং দুর্গতোরণ নহবৎখানায় রূপান্তরিত হয়। সেই গড়, দুর্গতোরণ আজও অবশিষ্ট আছে।

রাজা রামেশ্বর ছিলেন বিষ্ণু বা বাসুদেবের উপাসক। তাই ১৬৭৯ সালে বাঁশবেড়িয়ায় চারচালা বিশিষ্ট, অষ্টকোণাকৃতির টেরাকোটার একরত্ন অনন্তবাসুদেব মন্দিরটি তৈরি করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনন্তবাসুদেব হল বিষ্ণুর একটা রূপ। শোনা যায়, পাশা খেলায় পান্ডবরা পরাজিত হয়ে যখন সর্বস্ব হারিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াছিল তখন তারা কৃষ্ণের কাছে এর থেকে পরিত্রাণের উপায় জানতে চাইলে তিনি তাদেরকে জানান, পাশা খেলার জন্য লক্ষ্মী রুষ্ঠ হয়েছেন। তাই তিনি ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে বিষ্ণুর পুজো করার পরামর্শ দেন। সেইমতো পুজা করায় পান্ডবদের দুঃখ কষ্ট সব দূর হয়। আবার পুরাণ মতে নারদ একবার বিষ্ণুর কাছে তাঁর অনন্ত স্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভগবান বিষ্ণু তার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। সেই দিনটি ছিল ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথি। যা অনন্ত চতুর্দশী তিথি নামেও পরিচিত। সুতরাং, একথা মনে করা অমূলক নয় যে, রাজা রামেশ্বর মারাঠাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্যই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সকলের বোঝার সুবিধার্থে মন্দিরের ফলকে অনন্তবাসুদেবের পরিবর্তে বিষ্ণুমন্দির শব্দটি ব্যবহৃত করেন।

মন্দির গাত্রে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি ও পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র আছে। যেমন: শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, নৌকাবিলাস, দক্ষযজ্ঞ, মহিষাসুরমর্দিনী, হরধনুভঙ্গ, বিষ্ণুর দশাবতার, যুদ্ধের চিত্র, সামাজিক আচার-আচরণের চিত্র, নৌ জাহাজে সমুদ্র যাত্রার চিত্র এবং নৃত্যরতা নর্তকীর চিত্র ইত্যাদি। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বাসুদেব মন্দিরের ভাস্কর্যের কারিগর ছিলেন আরামবাগ মহকুমার কোতলপুর গ্রামের অধিবাসী; আবার কেউ কেউ বলেন তাঁরা ছিলেন কাটোয়ার সন্নিকটস্থ দাঁইহাট গ্রামের বাসিন্দা।[৩] অবহেলায় এই মন্দির আজ ভগ্নোমুখ। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই মন্দিরটি আজ লোকশ্রুতিতে রথমন্দির নামে পরিচিত। তাহলে এটা অনুমান করা যায় যে, বাঁশবেড়িয়ার ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম রত্ন মন্দির।[৪]

রাজা রামেশ্বরের পৌত্র নৃসিংহদেব ১৭৯২ সালের নভেম্বর মাসে কাশী গমন করেন। কাশীতে তান্ত্রিক সাধুদের সংস্পর্শে এসে তিনি তান্ত্রিক মতে যোগসাধনায় মন দেন। সেখানে একদিন রাত্রে রাজা নৃসিংহদেব স্বপ্নে দর্শন পান হংসেশ্বরী মায়ের। সেইমতো কাশীধামের নিকটবর্তী চুনার নামক পাহাড়ী এলাকা থেকে পাথর কিনে নৌকা বোঝাই করে এবং কয়েকজন কারিগর, শিল্পীকে নিয়ে ১৭৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বংশবাটিতে এসে পৌছান এবং ওই বছরেই মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মন্দিরের দ্বিতীয় তল গাঁথার সময়ে ১৮০২ সালে তিনি মারা যান। তাঁর এই অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী রাণী শঙ্করী। ১৮১৪ সালে এই মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। মনে করা হয়, রাজা নৃসিংহদেব বারাণসী থেকে যে নির্মাণ শিল্পীদের নিয়ে এসেছিলেন সম্ভবত তারা ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, যদিও এর কোন প্রামাণ্য নথি বিশেষভাবে পাওয়া যায় নি।

মন্দিরের গায়ের প্রস্তর ফলকে উল্লেখিত 'শ্রীমন্দিরং' শব্দের দুইটি তাৎপর্য আছে- পুরাণ অনুসারে 'শ্রী' শব্দের অর্থ হল দেবী লক্ষ্মী, সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবী। গীতার দশম অধ্যায়ে বলা আছে, সূর্যের আরেকটি রূপ হল বিষ্ণু। আর যেহেতু সূর্য ছাড়া কোন সম্পদের সৃষ্টি হতে পারেনা, তাই এই মন্দিরে দুই দেবতারই স্থান দেওয়া হয়েছে। অন্য আরেকটি মতানুসারে 'শ্রী' শব্দের অর্থ হল' the wealth of yoga', অর্থাৎ যে

তার স্বভাব দ্বারা যোগের সম্পদ কামনা করে তার জন্য এইটি মুক্তির প্রবেশদ্বার।[৫] সুতরাং শ্রীমন্দির হল সেই মন্দির যেখানে সাধক প্রাণায়ামের মাধ্যমে কুন্ডলিনীশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে অনাবিল আনন্দ ও মুক্তিলাভের পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। মন্দিরের ভিতরে হংসেশ্বরী মা থাকার জন্য এই মন্দির হংসেশ্বরী মন্দির নামে সর্বজনবিদিত।

এখন প্রশ্ন হল হংস বা হংসেশ্বরী শব্দের অর্থ কী? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'হংস' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে।[৬] 'হং'-কার হল শিব বা পরমপুরুষ এবং 'সঃ'-কার হল শক্তি বা প্রকৃতি। সুতরাং হংস হল পুরুষ-প্রকৃতির মিলন। এই হংসই হল জীবাত্মা। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের মতে" 'অহং' শব্দের 'অ'-কার শিবের এবং 'হং'-কার শক্তির দ্যোতক। শিব ও শক্তির অনুলোম-বিলোমে হেসৌ এবং সেহৌ নামে পরিচিত। হেসৌ"পরমহংস।=হংস বা শিবশক্তি =স+হ =[৭] তন্ত্রে যা হেসৌ এবং সেহৌ, বেদান্তে তাই হল 'হংসঃ সোহহম্'। বেদ এবং উপনিষদে বলা আছে 'হংসশব্দের অর্থ হল সূর্য বা জ্ঞান। অর্থাৎ যিনি ' ,আলোকস্বরূপা বা যিনি জ্ঞানস্বরূপা তিনি হলেন হংসেশ্বরী। আমাদের দেহের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে 'হংস' শব্দটি যুক্ত। 'হং' কার হল বহির্মুখী গতি, 'সঃ' কার হল অন্তমুখী গতি। এইটাই অজপা মন্ত্র নামে পরিচিত। এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সাধকের 'সোহং' অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম- এই জ্ঞান জন্মায়। অর্থাৎ যে নাম বা মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় তার ঈশ্বরী হলেন হংসেশ্বরী।

তান্ত্রিক যোগসাধনার প্রত্যক্ষ ফল হল এই হংসেশ্বরী মন্দির। কুন্ডলিনী শক্তির প্রকাশরূপে এই মন্দির গঠিত হয়েছে। এই কুন্ডলিনী শক্তি হল নিত্যানন্দস্বরূপা মহা শক্তি। তন্ত্র বা যোগসাধনার মূল উদ্দেশ্যেই হল এই শক্তিকে উপলব্ধি করা। 'কুন্ডলিনী যোগ' ব্যতীত সাধক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না। স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর মতে, "The word kundalini refers to the shakti or power when it is in its dormant potential state, but when it is manifesting, you can call it Devi, Kali, Durga, Saraswati, Lakshmi or any other name according to the manifestation it is exhibiting before you."[৮]

গৌতমীয়তন্ত্রের ৩৪ অধ্যায়ে বলা আছে-
"মূলপদ্মে কুন্ডলিনী যাব যাবন্নিদ্রাতি হে প্রভো।।২।।
তাবৎ কিঞ্চিত ন সিধ্যেত মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনা দিকম্।
জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুন্যসঞ্চয়ৈঃ।।৩।।
তদা প্রসাদমায়ান্তি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনানি চ।।"

অর্থাৎ যে পর্যন্ত মূলপদ্মে কুন্ডলিনী যাবৎ নিদ্রিত থাকেন, সে পর্যন্ত মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনা কিছুই সিদ্ধ হয় না। সেই দেবী পুণ্যফলে যদি জাগরিতা হন, তা হলে মন্ত্র তন্ত্র অর্চ্চনাদি সম্পন্ন হয়। কুন্ডলিনী শক্তি সাধনায় বলা হয় অনন্তজ্ঞান মানুষের শিরদাঁড়ার নীচে মূলাধারে কুন্ডলীভূত হয়ে আছে। প্রাণায়ামের মাধ্যমে কুন্ডলিনী শক্তি জাগরিত হয়। মনে আসে অনাবিল আনন্দ। ধীরে ধীরে আমাদের চেতনা ঊর্ধ্বমুখী হয়। পরে যখন কুলকুন্ডলিনী মস্তিষ্কে উপনীত হয়, তখনই সাধক হয়ে ওঠেন মহাপুরুষ। হংসেশ্বরী হলেন সেই কুন্ডলিনী শক্তির রূপ। আর এই মন্দির হল সেই সাধনার স্থাপত্যের রূপ বিশেষ।

তন্ত্রসাধনায় কুন্ডলিনীশক্তিকে কুলকুন্ডলিনীশক্তিও বলা হয়। কুলও মূলাধারের সাথে যুক্ত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কুল হল শক্তি, অকুল হল শিব। উভয়ের মিলনে হয় 'Kaula' বা শিব-

শক্তি[৯] বা হংস এবং দেবী হলেন kaulini বা হংসেশ্বরী। স্যার জন উডরফের মতে "Kulakuṇḍalinī is the vital Power of the universe. Her vehicle is the Hangsa of philosophy and religion. By Hangsa is to be understood the vital force, dual in its character, borne upon which She creates the universe."[১০]

তন্ত্রমতে আমাদের দেহে সাড়ে তিনলক্ষ নাড়ী আছে। এর মধ্যে চৌদ্দটি প্রধান। তার মধ্যেই আবার পাঁটটি-ইড়া, পিঙ্গালা, সুষুম্না, বজ্রাণী এবং চিত্রানী গুরুত্বপূর্ণ। এই মন্দিরেও একই ধাঁচে সিড়ি আছে। কুন্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে অনাবিল আনন্দের স্তরে পৌঁছানোর জন্য সিড়িগুলি ব্যবহৃত হয়। প্রতিষ্ঠার সময়ে ইড়া, পিঙ্গালা সিড়ি দুইটি কাঠের ছিল। বর্তমানে যার কোন অস্তিত্ব নেই। সুষুম্না সিড়িটি ইটের তৈরী। এই সুষুম্না মধ্যেই বজ্রাণী এবং বজ্রাণীর মধ্যে চিত্রিণীর অবস্থান। যদিও বর্তমানে এই সিড়ি দিয়ে উপরে ওঠা পুরোপুরি বন্ধ। সুষুম্না নাড়ীর মধ্যেই ছয়টি চক্র অবস্থিত।
শিবসংহিতার দ্বিতীয় পটলের ২৭ নং শ্লোকে বলা আছে-

"ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না যা ভবেৎ খলু।
ষটস্থানেষু চ ষটশক্তিং ষটপদ্মং যোগিনো বিদুঃ।"

তান্ত্রিক মত অনুযায়ী আমাদের দেহকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ভাগ 'চক্র' বা তন্ত্র সাধকদের কাছে 'পদ্ম' নামে পরিচিত। ষটচক্র বা পদ্ম গুলি হল মূলধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা। এই ছয়টি চক্র অতিক্রম করলে তবেই সহস্রারে পরম শিবের সাথে মিলন ঘটে। হংসেশ্বরী মন্দিরও এই আদলে তৈরী হয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহটি হল মূলধার। মূলাধার যেমন পৃথিবীর সাথে যুক্ত তেমনি স্বাধিষ্ঠান হল জলের সাথে সম্পর্কিত। মন্দিরের প্রথম তলটি হল মণিপুর চক্র। সদাশিবলিঙ্গ মন্দিরের চতুর্থ তলায় অবস্থিত, যা হল অনাহত চক্র। বিশুদ্ধ চক্র হল খুব সরু সিড়ি যুক্ত একটা বড় কক্ষ, যা ছাদে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই সিড়ি দিয়েই আজ্ঞা তে পৌঁছানো যায়। এরপর সহস্রারে। যখন কুন্ডলিনীশক্তি সহস্রদল পদ্মে পরমশিবের সাথে মিলিত হয় তখন উভয়ের মিলনকে সামরস্যানুভূতি বলা হয়। ফলে সাধক পরমানন্দ অনুভব করে। কুন্ডলিনীশক্তি যখন মূলাধার চক্র ভেদ করে অন্যান্য চক্রে উপনীত হয় তখন চক্র বা পদ্মের পাপড়িগুলি প্রস্ফুটিত হয়। তাই মন্দিরের প্রত্যেকটি চূড়া প্রস্ফুটিত পদ্মের আদলে গঠিত। শুধু তাই নয়, মন্দিরের চূড়াগুলি মূলাধার চক্রের আদলে তৈরী। এই মূলাধার চক্রটি চতুর্দল পদ্ম বিশিষ্ট, যার মাঝখানে চতুষ্কোণ ধরা বা মন্ডলটি আটটি ত্রিশূল দ্বারা বেষ্টিত। এর মধ্যভাগে ধরা বীজ 'লং' অবস্থিত। আবার এই বীজের বিন্দুর মধ্যে রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ শিশু ব্রহ্মা উপবিষ্ট। এই মূলাধার চক্রের চারটি পদ্ম মন্দিরের চারটি শিখর, আটটি ত্রিশূল মন্দিরের বাকি আটটি চূড়া ও মন্দিরের লাল রঙের চূড়াটি শিশু ব্রহ্মার প্রতীক এবং ব্রহ্মার চারটি মুখ মন্দিরের চারটি দরজার ইঙ্গিতবাহী। মন্দিরের ১৩টি চূড়ার মধ্যে মাঝের চূড়ার উপরে আছে ধাতুনির্মিত সূর্যদেবতার প্রতিকৃতি। এর পাশাপাশি এটি বিজলীদন্ড এবং সহস্রারেও পরিচায়ক।

মন্দিরের পশ্চিমদিকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আছে। যা দেখে অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগে শাক্ত মন্দিরে রাধা কৃষ্ণের মূর্তি কেন। কিন্তু তা কোন অংশে অযৌক্তিক নয়। রাধাতন্ত্রের অষ্টম পটলের ৫৯ নং শ্লোকে বলা আছে,

"পুষ্যর্ক্ষেচ নবম্যাং বৈ শুক্লপক্ষে শুচিস্মিতে।
জাতা রাধা মহেশানি স্বয়ং প্রকৃতি পদ্মিনী।"

অর্থাৎ, স্বয়ং প্রকৃতি পদ্মিনী রাধারূপে পুষ্যানক্ষত্রে শুক্লপক্ষে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ পটলের ১৩নং শ্লোকে উল্লিখিত আছে-

"তত্রৈব সহসা দেবি ব্রহ্ম শব্দ ময়ং স্মৃতং।
ব্রহ্ম শব্দস্ত দেবেশি কৃষ্ণঃ সত্ব গুণাশ্রয়ঃ।।"
অর্থাৎ, কৃষ্ণই হল ব্রহ্ম বা পরমপুরুষ।

আবার, অষ্টাদশ পটলে উল্লেখ আছে, মহাবিষ্ণু বাসুদেব ত্রিপুরাদেবীর অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে নানাদেহধারী হয়ে নানা কার্য করেন। বাসুদেব কৃষ্ণমূর্তি আশ্রয় করে পদ্মিনী সাথে মহাকালী মহাবিদ্যার আরাধনা করেন। 'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থে বলা আছে-

"মহারুদ্রঃ স এবাত্মা মহাবিষ্ণুঃ স এব হি।
মহাব্রহ্মা স এবাত্মা বিভেদকঃ।।
স্ত্রিনামানি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।।
নানাভাবে মনো যস্য তস্য মোক্ষো ন বিদ্যতে।।"

অর্থাৎ পরমাত্মাই মহারুদ্র, মহাবিষ্ণু, মহাব্রহ্ম। নানানামে নানামূর্তিতে নানাভাবে যার মনকে উদ্রেক করে, তার থেকে মুক্তি নেই।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র গ্রন্থের প্রথমরাত্র-র তৃতীয় অধ্যায়ে বলা আছে যারা বৈষ্ণব তারাও কুন্ডলিনীকে সহস্রারে পুরুষের সাথে সংযুক্ত করবার সময়ে কুন্ডলিনীকে পরাপ্রকৃতি-রূপিণী রাধা এবং সহস্রারস্থিত পরমপুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ বলে কল্পনা করেন। আবার দ্বিতীয়রাত্র-র ৮ম অধ্যায়ে বলা আছে--

"কৃষ্ণোনিত্যঃ শরীরী চ তস্য তেজো হি বর্ত্ততে।
তেজোহভ্যন্তর এবাহ কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ।।৩৪।।
ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে তত্তেজো ভক্তিপূর্ব্বকং।
সুপক্কক্ত্যা কালেন যোগী চ বৈষ্ণবো ভবেৎ।।৩৫।।"

অর্থাৎ কৃষ্ণ নিত্যঃ ও শরীরী এবং তার তেজ আছে। সেই তেজের অভ্যন্তরে কৃষ্ণমূর্তি আছে। যোগিরা ভক্তিপূর্বক সেই তেজের ধ্যান করেন। ভক্তিসহযোগে কালান্তরে যোগীরাও বৈষ্ণব হয়।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন তন্ত্রশাস্ত্র যদি কেবল শাক্তের শাস্ত্র হয় তাহলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ দীক্ষাগুরু অদ্বৈতবংশ নিত্যানন্দবংশ প্রভৃতি গোস্বামীরা এতকাল নিজ নিজ গুরু-গৌরব রক্ষা করে আসছেন কোন শাস্ত্রের জোরে।[১১] সুতরাং, তন্ত্র সাধনায় কালী বা মহাকালী, বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। এই প্রসঙ্গে সংযুক্তা গুপ্ত 'The Domestication of a Goddess: carana -tirtha kalighat, the Mahapitha of kali' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন "The goddesses Ṣaṣṭhī (the protectress of children), Śītalā (the goddess of smallpox and other epidemics), and Manasā (the snake goddess) are all incorporated into the fifteenth-century Śākta Brahmavaivarta Purāṇa. Even Rādhikā, the cowherd women beloved of kṛṣṇa, is elevated to the status of the divine power, the cosmic mother, in Śākta Purāṇas such as the Devībhāgavata and Brahmavaivarta Purāṇas. Seen from this perspective, then , there is nothing incongruous in being a devotee of kṛṣṇa/Viṣṇu and Kālī at the same time, or in finding Ṣaṣṭhī, Śītalā and Manasā integrated into the temple worship of Kālī"[১২]

হংসেশ্বরী মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। মন্দিরের চারিদিকে বারান্দা এবং সামনে প্রশস্থ চত্বর। মন্দিরে মোট ১৪টি শিব আছে। মন্দিরে প্রবেশের মূলপথে আছে তিনটি খিলানযুক্ত বারান্দা। মন্দিরের একেবারে সামনের ছাদের শিলিং-এ আছে অসংখ্য কারুকার্য। মনে করা হতো গর্ভগৃহের সমতলে নাটমন্দিরস্থ ফোয়ারাটি গঙ্গার সাথে যুক্ত এবং জোয়ারের সময় তা থেকে জল উঠতো। প্রকৃতপক্ষে এইটি মন্দিরস্থ শিবঘরের পাশে একটি চৌবাচ্চার সাথে যুক্ত। মন্দিরের পিছনের সিড়িটি বর্গীদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য তৈরী করা হয়েছিল বলে মনে করা হলেও আসলে নাটমন্দিরের সম্মুখস্থ ফোয়ারা এবং সিড়িটি যথাক্রমে লিঙ্গ এবং পায়ুদ্বারের ইঙ্গিতবাহী। দক্ষিণদিকের দরজার উপর নানা ফুল, লতা গুল্মের ছবি সহ সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি আছে। এখন প্রশ্ন হল, এর কারণ কী। প্রাচীনকালে গণেশের সাথে তন্ত্রের সম্পর্ক ছিল। যার প্রমাণ হিসাবে জাভার বড়া নামক স্থানে গণেশের একটি মধ্যযুগীয় মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটি মানুষের খুলির ওপর বসে আছে, আর তার মাথার জটা থেকেও খুলি ঝুলছে।[১৩] আনন্দগিরির 'শঙ্করাদিগ্বিজয়' এবং ডিন্ডিমাখ্যার ভাষ্যে গণেশের ছয়টি উপাসকদের মধ্যে মহাগণপতির উপাসক গজানন শক্তির সাথে সম্পর্কিত এবং তিনি হলেন জগতের স্রষ্টা এবং উচ্ছিষ্টা গণপতির উপাসকরা হল তন্ত্রানুসারী।[১৪] শ্রীবিদ্যা দীক্ষার পূর্বশর্তই হল গণপতির মূলমন্ত্র এবং গণেশের পূজা ললিতার মহাবিদ্যার অনুষঙ্গ মাত্র।[১৫] শুধু তাই নয়, গণেশের পূজা প্রতিটি আচারের শুরুতে করা উচিত কারণ তা সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর করতেও সাহায্য করে। কমলাতন্ত্রের অষ্টমপটলে বলা আছে একজন সাধক প্রথমে একমুঠো ফুল দিয়ে দরজা-দেবতাকে পুজো করে তবেই উপাসনাকক্ষে প্রবেশ করা উচিত। আবার গৌতমীয়তন্ত্রের অষ্টম অধ্যায়ে বলা আছে, 'অপসর্পন্তু তে ভূতা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে একজন সাধক প্রথমে ডান পা দিয়ে এবং মাথানত করে সাধনার ঘরে প্রবেশ করবেন।

হংসেশ্বরী মায়ের মূর্তিটি অভিনবত্বে ভরপুর। প্রথম দর্শনে মাকে কালী বলে বোঝা যাবে না। আধঘোমটা দিয়ে শান্ত চোখে হাসিমুখে বসে আছেন সন্তানের ডাকে সাড়া দেবার জন্য। দেবী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী। মায়ের মূর্তিটি নিমকাঠের তৈরি এবং তিনি নীলবর্ণা। কিন্তু কিছু স্থানীয় প্রবীণ নাগরিকদের মতে আগে এই দেবীর রং গাঢ় সবুজ ছিল পরে রঙের পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কুন্ডলিনী শক্তির রং হল নীল। নীল ও সবুজ একই বিভাগের অন্তর্গত এবং তাই এদের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই।[১৬]

মায়ের মুখে সবসময়ে কোন জিহ্বা দেখা যায় না। কেবলমাত্র দ্বীপান্বিতা কালীপুজোর রাত্রে একটি মুখোশ পরিয়ে দেওয়া হয়, যা আদ্যাশক্তি কালীর মুখের অনুরূপ। তখন মা হয়ে ওঠেন মুক্তকেশী, করালবদনা, লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী কালী। মায়ের পুজো হয় দক্ষিণাকালীর মন্ত্রে। মায়ের চারটি হাতের মধ্যে বামদিকের ঊর্ধ্ব বাহুতে আছে অসুর নিধনকারী খড়্গ, নীচের বাহুতে একটি নরমুন্ড। ডানদিকের ঊর্ধ্ববাহুটি বরাভয় এবং নিম্নবাহুটি সিদ্ধির প্রতীক। কিন্তু নরমুন্ড এবং খড়্গের অবস্থান দেখলে বোঝা যায় এই গুলি পরবর্তীকালে যোগ করা হয়েছিল। মায়ের বৃত্তাকার বেদীতে সহস্র পদ্ম, অষ্টদল পদ্ম, বৃত্ত, পঞ্চত্রিকোণযন্ত্র, তার উপরে শায়িত শিব এবং তার হৃদয় থেকে উত্থিত একটি প্রস্ফুটিত দ্বাদশদল বিশিষ্ট পদ্মাসনে উপবিষ্টা আছেন মা হংসেশ্বরী। এই চিহ্নগুলির সাথে কালীযন্ত্রে ব্যবহৃত চিহ্নগুলির অনেক মিল থাকায় প্রাথমিকভাবে হংসেশ্বরী মাকে কালী হিসাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। কালী বিন্দুতে আবির্ভূতা হন, অষ্টদল পদ্ম হল প্রকৃতির আটটি উপাদান-পৃথিবী, জল, বায়ু, আগুন, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংবোধ। বৃত্তটি মায়া বা

অবিদ্যা বা অজ্ঞানের প্রতীক। পাঁচটি ত্রিভুজের পনেরোটি কোণ হল পঞ্চজ্ঞাণেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু বা পঞ্চপ্রাণেন্দ্রিয়।

তন্ত্রসাধনায় গুরুপাদুকার অর্থ হল সকলগুরুর স্থান। গুরু অর্থাৎ পরমশিব বা শিব-শক্তিরূপ বা হংস। পাদুকা অর্থাৎ আসন। সুতরাং, গুরুপাদুকা হল পরমশিবের আসন। এই গুরুপাদুকার প্রতীক হল ষড়দলযুক্ত পদ্ম। শক্তি সাধনায় গুরুপাদুকায় সাজানো থাকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত (৬×২=)১২টি বীজ মন্ত্র বা দ্বাদশদল পদ্ম। হংসেশ্বরী দেবীও তাই দ্বাদশদল পদ্মের উপর উপবিষ্টা। মানবদেহের পাঁচটি নাড়ীর কথা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু চিত্রিণি বা চিত্রাণী নাড়ীর মধ্যে আরেকটি নাড়ী আছে। যাকে ব্রহ্মনাড়ী বলে। অনেকে চিত্রিণি বা চিত্রাণী নাড়ীকেই ব্রহ্মনাড়ী বলেছেন, যা মূলাধার থেকে সোজা সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত বিস্তৃত, যা কুন্ডলিনী শক্তির যাতায়াতের পথ। এই মন্দিরেও একইভাবে শিবের মূলধার থেকে যে দন্ডটি সোজা উপরে উঠে গেছে, সেইটি আসলে কুন্ডলিনী শক্তির যাতায়াতের পথ। আবার অন্যার্থে দ্বাদশদল পদ্মটি অনাহত চক্রের দ্বাদশদল পদ্মের সাথেও সম্পর্কিত। তন্ত্র মতানুসারে, অনাহতের মূলে একটি ইচ্ছা পূরণকারী গাছ আছে, যা কল্পবৃক্ষ নামে পরিচিত। যখন এই গাছটি ফল দিতে শুরু করে তখন মনের ইচ্ছা পূরণ হয়। তান্ত্রিক গ্রন্থে মাতৃদেবী ললিতার আরাধনার যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে ইচ্ছা-পূরণকারী গাছের খাঁজে তার বাসস্থান।[১৭]

হংসেশ্বরী মাকে কালী এবং কুন্ডলিনী শক্তির প্রকাশক হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও David Kinsley তাঁর Tantric visions of the Divine Feminine The Ten Mahavidyas নামক গ্রন্থে হংসেশ্বরী মাকে 'ত্রিপুরাসুন্দরী' বলে চিহ্নিত করে লিখেছেন "I also have been told of a temple to Harhsesvari-devi, an epithet of Tripura-sundari, in the village of Bansberia near Hooghly in Bengal. The temple is six stories tall, and the central image is of Tripura-sundari, who sits on a lotus that emerges from the navel of Siva, who is reclining on another lotus that in turn rests on an image of the Sri Cakra. There are fifteen black lirigams in the temple and a sixteenth that is white. The sixteenth may symbolize Tripura-Sundari as Sodasi, "she who is the sixteenth" or "the one who goes beyond or includes the fifteen lunar tithis". The temple also has three staircases, one on the right of the image, another on the left, and a third descending into the temple. I hese probably represent the three nddis(venis or arteries) of kundalini yoga and, taken together, the whole of reality. A temple of similar design to Tripura-sundari is currently under construction in varanasi."[১৮] ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসনায় শ্রীচক্রসাধনা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীচক্রের জ্যামিতিক চিহ্নগুলিও এই মন্দিরের গর্ভগৃহে আংশিকভাবে দেখতে পাওয়া যায়। অষ্টদলপদ্ম 'Sarva-saṅkshobhana' নামে পরিচিত। প্রতিটি আটটি পাপড়ি আটটি শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে - ১) পূর্বে Anaṅga-Kusumā- বক্তৃতা এবং অভিব্যক্তি, ২) দক্ষিণে Anaṅga-mekhalā- আশঙ্কা ও অভ্যর্থনা, ৩) পশ্চিমে Anaṅga-madanā- গতিবিধি, ৪) উত্তরে Anaṅga-madanāturā- নিঃসরণ, ৫) দক্ষিণ-পূর্বে Anaṅga-rekhā- আনন্দ, ৬) দক্ষিণ-পশ্চিমে Anaṅga-Veginī- প্রত্যাখ্যান, ৭) উত্তর-পশ্চিমে Anaṅga-madanāṅkuśā- মনোযোগ, ৮) উত্তর-পূর্বে Anaṅga-mālinī- বিচ্ছিন্নতা। বৃত্তটি সচেতনতার চক্রাকার গতিশীলতাকে বোঝায় এবং ত্রিবৃত্ত হল তিনটি বিশ্বের প্রতীক। লাল রেখাটি মূলত শক্তির প্রতীক। ত্রিভূজটি 'Sarva-Siddhi-pradā-chakra' নামে পরিচিত। ত্রিভুজের তিনটি কোণ মাতৃদেবীর তিনটি রূপকে বোঝায়- কামেশ্বরী (চন্দ্র), বজ্রেশ্বরী (সূর্য)এবং ভগামালিনী (অগ্নি)। তিনটি লাইন তিনটি গুণের এবং দেবতার প্রতীক- সত্ত্বজ্যেষ্ঠা এবং ,রুদ্র। আবার এই ত্রিভুজটি দেবী বামা-বিষ্ণু এবং তমস-রাজস ,ব্রহ্ম-

রৌদ্রীর প্রকাশ। এইটি আবার একাধারে স্ত্রীজননাঙ্গের প্রতীক। ত্রিভুজের তিনটি কোণ বাকশক্তির তিনটি রূপকেও বোঝায়- পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং ভাইখারি। এই ত্রিভুজগুলো সাধারণত লাল রঙের হয়, কারণ তা তেজস্ক্রিয় শক্তি বা মহাজগতের গতিশীল এবং জ্বলন্ত উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে।[১৯] আবার তন্ত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল বিন্দু, বীজ এবং নাদ। পরাবিন্দু থেকেই এই ত্রিতত্ত্বের বিকাশ হয়।[২০] শিব হল বিন্দু, শক্তি হল বীজ এবং নাদ হল বিন্দু ও বীজের সম্মিলিত রূপ। তন্ত্রে বিন্দু, বীজ এবং নাদ-কে অ-ক-থ চক্র বা ত্রিকোণ বলা হয়। এই ত্রিকোণই হল 'কামকলা', আবার তা 'কুন্ডলিনী' নামেও পরিচিত। এই কুন্ডলিনী শক্তি ত্রিগুণ সম্পন্ন, তাই তাকে ত্রিপুরাসুন্দরীও বলা হয়।[২১] ত্রিভুজটি আবার শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ এইটি ত্রিগুণের প্রকাশ- ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞান।[২২] পাঁচটি ত্রিভুজ জগতের পাঁচটি উপাদান পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ এবং মানবদেহের পাঁচটি উপাদানের উৎস- মাংস, চর্বি, ত্বক, রক্ত এবং অস্থিরও প্রতীক। আবার দেবীমূর্তিকে কুন্ডলিনী শক্তির প্রকাশ হিসাবে দেখলে কুন্ডলিনীর জাগরণের সাথে পঞ্চপ্রাণ ওতোপ্রতোভাবে জড়িত, যা শরীরকে পরিচালনা করে- উডানা, প্রাণা, সামানা, অজানা ও ভানা। সেইদিক দিয়ে দেখলে পঞ্চত্রিকোণ আবার পঞ্চপ্রাণেরও দ্যোতক। এই ত্রিভুজের কেন্দ্রে অবস্থিত বিন্দুটি Sarvānanda-maya নামে পরিচিত। যা হল মাতৃকাদেবীর বাসস্থান। পুরো নকশাটি একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। এই বর্গক্ষেত্রটি 'Trailokya-mohana-chakra', যা তিনটি লাইন নিয়ে গঠিত। এরমধ্যে প্রথম দশটি 'সিদ্ধি', দ্বিতীয়টি আটটি মাতৃদেবতার এবং তৃতীয়তটি দশটি মহিলা রক্ষক বা মুদ্রাশক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। এই বর্গক্ষেত্রটি(ভুপুর) জগতকে বোঝায়। বর্গক্ষেত্রটির প্রতিটি দিকে 'āmnāya' নামে T-আকৃতির পোর্টাল বা দরজা আছে, যার মাধ্যমে মহাজাগতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায়। S.K.Ramchandra Rao-এর মতে ভুপুরার চারটি কোণ খাটের চারটি পায়ার এবং খাটের তক্তাটি সদাশিবের প্রতিনিধিত্ব করে, যার উপর মাতৃদেবী বিশ্রাম করছেন। এই খাটের চারটি পায়া চারটি নীতির প্রতীক- মায়া (ব্রহ্মা), শুদ্ধ বিদ্যা (বিষ্ণু), মহেশ্বর (রুদ্র) এবং সদাশিব (ঈশান)।[২৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ত্রিবৃত্ত, অষ্টদলপদ্ম, তিনটি লাইনযুক্ত বর্গক্ষেত্রটি শৈব উপ-চক্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

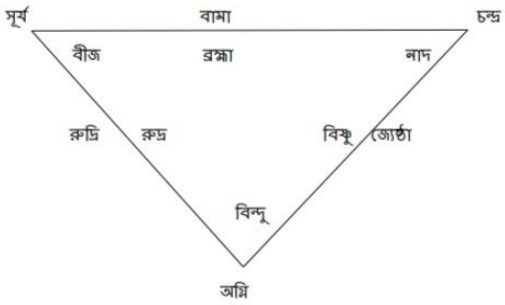

মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার তিনটি পর্যায় ধারাবাহিকভাবে চলছে- উদ্ভাবন, রক্ষণ এবং বিলুপ্তি। Madhu Khanna Tantraraja Tantra গ্রন্থের ভিত্তিতে শ্রীযন্ত্র এবং মহাজাগতিক পর্যায়গুলির একটি সমীকরণ তুলে ধরেছেন- বর্গক্ষেত্রটি উদ্ভাবন, অষ্টদলপদ্মটি উদ্ভাবন ও বিলুপ্তির, ত্রিভুজটি বিলুপ্তি ও রক্ষণের এবং বিন্দুটি বিলুপ্তির সাথে সম্পর্কিত।[২৪] শ্রীযন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের দেহের চক্রের সাথেও সম্পর্কিত- বর্গক্ষেত্রটি মূলাধার, অষ্টদলপদ্ম মণিপুর চক্র, ত্রিকোণটি 'chakra of the Supreme' এবং বিন্দুটি সহস্রারের প্রতিনিধিত্ব করে।[২৫] কিন্তু S.K.Ramchandra Rao অষ্টদলপদ্মকে স্বাধিষ্ঠান, বিন্দুটি বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা চক্রের সাথে সম্পর্কিত বলে চিহ্নিত করেন।[২৬] তিনি আরও বলেন শারীরিক কেন্দ্রগুলি তিনটি গ্রন্থিতে বিভক্ত-স্বাধিষ্ঠান কেন্দ্রে রুদ্রগ্রন্থি, অনাহত কেন্দ্রে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং ব্রহ্মা গ্রন্থি আজ্ঞা কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত, যা তিনটি বৃত্তের প্রতিনিধিত্ব করে, যা সহস্রদলপদ্মেরও প্রতিনিধিত্ব করে।[২৭]

ললিতাসহস্রনাম হল ত্রিপুরাসুন্দরীর আরেকনাম। যা থেকে দুই দেবীর মধ্যে সংযোগ আরও দৃঢ় হয়। ১) Om Kul'āmṛt'aika-rasikāyani namaḥ- তাকে প্রণাম যিনি (কুন্ডলিনী হিসাবে) সহস্রার থেকে সমস্ত কুলপথের (সুষুম্না) মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত অমৃতে প্রকাশ করে।[২৮] ২) Om kaulinyani namah- তাকে নমস্কার যাকে বলা হয় 'kaulini'।[২৯] ৩) Om mul'ādhār'aika-nilāyayani namah- তাকে প্রণাম যার প্রধান বাসস্থান হল মুলাধার।[৩০] ৪) Om ṣaṭ-cakr'opari-samsthitāyani namaḥ- তাকে প্রণাম যিনি নিজেকে ছয়চক্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছন।[৩১] ৫) Om kuṇḍalinyani namah- তাকে প্রণাম যিনি কুন্ডলিনীরূপে মূলাধারায় বসবাস করেন।[৩২] ৬) Om bhāvanā-gamyāyani namaḥ- তাকে প্রণাম যাকে একনিষ্ঠ ধ্যানের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়।[৩৩] ৭) Om śrīkaryani namaḥ- তাকে প্রণাম যিনি বিষ্ণুর পত্নী এবং ভক্তদের সমৃদ্ধি নিয়ে আসেন।[৩৪] ৮) Om hamsinyai namaḥ- তাকে প্রণাম যিনি হংসমন্ত্র।[৩৫] ৯) Om dara-hās'ojjvalan-mukhyani namaḥ- তাকে প্রণাম যার মুখ মৃদু হাসিতে আলোকিত করে।[৩৬] ১০) Om śiva-śakty'aikya- rūpiṇyai namah- তাকে প্রণাম যিনি শিব-শক্তির মিলনরূপ।[৩৭]

রাজেশ্বরী ঘোষ অজপা হংসমন্ত্রকে শ্রীবিদ্যার সাথে যুক্ত করে বলেন কামকলাই হল শব্দব্রহ্ম, যা শ্রীবিদ্যার প্রধান মাত্রা, আবার হংসের সাথে সম্পর্কিত।[৩৮] প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণভারতীয় শ্রীবিদ্যার উপাসনায় ত্রিপুরেশ্বরীদেবী এবং উত্তরভারতীয় কালীসাধনায় দক্ষিণাকালী এক ও অভিন্ন; তবে দেবী কালীকার ষটচক্র এবং ত্রিপুরাসুন্দরীর নবচক্রের পার্থক্য থাকলেও উভয়ের সিদ্ধান্ত এক। বঙ্গে কালী বা দক্ষিণাকালীর কৃপা বেশী। খুবসম্ভবত বেনারসে তন্ত্র প্রশিক্ষণের সময়ে রাজা নৃসিংহদেব শ্রীবিদ্যার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। তারই ফল হল উভয়ের সংমিশ্রিত রূপ দেবী হংসেশ্বরী।

তথ্যসূত্র:

১) A.G. Bower, The family History of the Bansberia Raj, A.G. Bower, কলকাতা, ১৮৯৬, পৃষ্ঠাঃ ৪।

২) শম্ভুচন্দ্র দে, The Bansberia Raj, কলকাতা, ১৯০৮, B.B.মুন্সী, পৃষ্ঠাঃ ২৩।

৩) বিজয়চন্দ্র কর্মকার, ইতিহাসে বাঁশবেড়িয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৩, বাঁশবেড়িয়া, পৃষ্ঠাঃ ১৪০।

৪) নিলয় সরকার, 'লোকায়ত মন্দিরকলায় বাঁশবেড়িয়ার দেব-দেউল', অসীম ঘোষ হাজরা সম্পাদিত, গ্রন্থিক: বাঁশবেড়িয়া সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠাঃ ১২।

৫) Sir John Woodroffe, The Serpent Power, Ganesh & Co. (Madras) Ltd., ১৯৫০, পৃষ্ঠাঃ ৩৮৯।

৬) Rajeshwari Ghosh, The Tyāgarāja cult in Tamilnāḍu: A study in conflict and Accommodation, মোতিলাল বেনারসিদাস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠাঃ ১০৭।

৭) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৫৯, পৃষ্ঠাঃ ১০৭।

৮) https://sriyogaashram.com/ebook/Swami-Satyananda-Saraswati-Kundalini-Tantra.pdf

৯) Douglas Renfrew Brooks, Auspicious Wisdom: The Texts and Traditions of Srividya Sakta Tantrism in South India, State University of New York Press, ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ২৩।

১০) Sir John Woodroffe, Principles of Tantra, Ganesh & co. (Madras) Ltd. Madras, ১৯৫২, পৃষ্ঠাঃ ৫৯৯।

১১) শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য, তন্ত্রতত্ত্ব, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৯, কলকাতা, পৃষ্ঠাঃ ৮৬।

১২) সংযুক্তা গুপ্ত, 'The Domestication of a Goddess: caraṇa-tīrtha kālīghāṭ, the Mahāpīṭha of kālī', Rachel Fell McDermott and Jeffrey J. kripal সম্পাদিত Encountering kali, university of California press, ২০০৩, পৃষ্ঠা: ৬৫।

১৩) J.N. Banerjea, Puranic and Tantric Cult, university of Calcutta, ১৯৬৬, পৃষ্ঠাঃ ১৫৩।

১৪) N.N. Bhattacharyya, History of The Tantric Religion, Manohar Publishers & distributors, দিল্লি, ২০০৫, পৃষ্ঠাঃ ২৫৭।

১৫) Douglas Renfrew Brooks, Auspicious Wisdom: The Texts and Traditions of Srividya Sakta Tantrism in South India, State University of New York Press, ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ১১১।

১৬) Sir John Woodroffe, The Serpent Power, Ganesh & Co. (Madras) Ltd, ১৯৫০, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৫।

১৭) S.K. Ramachandra Rao, The Tantra of Sri-Chakra, শারদা প্রকাশনী, বেঙ্গালোর, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা: ৬৯।

১৮) David Kinsley, Tantric visions of the Divine Feminine, মোতিলাল বেনারসিদাস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা: ১১৫।

১৯) Ajit Mookerjee, Madhu Khanna, The Tantric Way: Art, Science, Ritual, বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা: ৬১।

২০) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৫৯, পৃষ্ঠাঃ ১৪৯।

২১) Sir John Woodroffe, The Serpent Power, Ganesh & Co. (Madras) Ltd, ১৯৫০, পৃষ্ঠা: ১৩৪।
২২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১২৯।
২৩) S.k. Ramachandra Rao, Sri-Chakra: Its Yantra, Mantra and Tantra, শ্রী সদগুরু পাবলিকেশন, দিল্লি, ২০১১, পৃষ্ঠা: ৯৫।
২৪) Madhu Khanna, Yantra: The Tantric symbol Of Cosmic Unity, Thames and Hudson ltd, লন্ডন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা: ৭৮।
২৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১২৩।
২৬) S.k. Ramachandra Rao, Śri-Chakra: Its Yantra, Mantra and Tantra, শ্রী সদগুরু পাবলিকেশন, দিল্লি, ২০১১, পৃষ্ঠা: ৯৩।
২৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৯৪।
২৮) Swami Tapasyananda সম্পাদিত, Śrī Lalitā Sahasranāma, শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ, ম্যাড্রাস, পৃষ্ঠাঃ ১১০, (৯০ নং)।
২৯) পূর্বোক্ত, (৯৪ নং)।
৩০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১১১। (৯৯ নং।(
৩১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১১৩, (১০৮ নং)।
৩২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১১৪, (১১০ নং)।
৩৩) পূর্বোক্ত, (১১৩ নং)।
৩৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১১৭, (১২৭ নং)।
৩৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১৭৯, (৪৫৬ নং)।
৩৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাঃ ২০৭, (৬০২ নং)।
৩৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাঃ ২৮১, (৯৯৯ নং)।
৩৮) Rajeshwari Ghosh, The Tyāgarāja cult in Tamilnāḍu: A study in conflict and Accommodation, মোতিলাল বেনারসিদাস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা: ১২১।

অনন্তবাসুদেব ও হংসেশ্বরী মন্দির

পরিখা

দুর্গ তোরণ

রাসচক্র

রাধাকৃষ্ণের লীলা

নৌকা বিলাস

কালী ও নারায়ণ

কৃষ্ণের কালিয়দমন (উপরে) নৃত্যরত কলা কুশলী (নিচে)

ময়ূরপঙ্খী নৌকা

টেরাকোটার ফুল

মাঝের চূড়ার উপরে ধাতু নির্মিত সূর্যদেবতার প্রতিকৃতি

দক্ষিণদিকের দরজার উপর ফুল, লতা ও ছবি সহ সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি

হংসেশ্বরী মায়ের মূর্তি

নাটমন্দিরস্থ ফোয়ারা

পরিখা থেকে হংসেশ্বরী মায়ের মন্দির